ভারতে মানবাধিকার (Human Rights in India) ঃ

প্রাচীন ভারতে মানবাধিকারের স্বপক্ষে অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বাণী, সম্রাট অশোকের অহিংসা ও সাম্যের বাণী মানবাধিকারেরই জয়গান গেয়েছিল। জৈন ও শিখ ধর্ম ও মানবতার পক্ষে সওয়াল করেছিল। ইসলাম শান্তি ও সাম্যের বাণী নিয়ে এসেছে।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকাতেই মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। রাওলাট বিল বিরোধী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ, সাইমন কমিশন, বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি ছিল একই সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী ও মানবাধিকার আন্দোলন। মানুষের অধিকারগুলি আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ১৮১৫ সালে মানবাধিকারের একটি রূপরেখা তৈরি করে। পরবর্তীকালে ১৯১৮-তে অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা হয়। এখানে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার অধিকার এবং জাতিবৈষম্য থেকে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই ঘোষণাপত্র খারিজ করে দেয়। ১৯৩৬ সালে প্রথম Indian Civil Liberties Union নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনের সাম্মানিক সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংরেজ শাসন আমলে যে সকল আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল মানুষের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল এক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নীলবিদ্রোহ, বিভিন্ন কৃষকবিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি ছিল ব্রিটিশ শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক একটি প্রতিবাদী মানবাধিকার আন্দোলন। বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া তেভাগা, তেলেঙ্গানা আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের অধিকার রক্ষায় লড়াই হিসাবে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিককালে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনেরই এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এছাড়াও প্রস্তাবনা ব্যক্তির

Scanned with CamScanner

চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অনেক অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (১২-১৫ নং ধারা) মৌলিক অধিকার নামে রচিত হয়েছে মানবাধিকারের এক বিশাল অধ্যায়। এখানে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ৬টি মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে।

(১) সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ নং ধারা), (২) স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ নং ধারা), (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩-২৪ নং ধারা), (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮ নং ধারা), (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক অধিকার (২৯-৩০ নং ধারা), (৬) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২ নং ধারা)।

ভারতীয় নাগরিকরা যাতে এই মৌলিক অধিকারগুলি যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে সেজন্য সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এই অধিকারটি ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষক বা রক্ষাকর্তা হিসাবে কাজ করছে।

সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলে জনকল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হবে ৩৮ (১) নং ধারা।

৪২তম সংবিধান সংশোধন আইনে (১৯৭৬) বলা হয়েছে যে, স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাধীন পরিবেশে শিশুরা যাতে বড়ো হওয়ার সুযোগ পায়, শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণ ও দুর্দশামুক্ত হয় সেজন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪১ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক ক্ষমতার অনুপাতে শিক্ষা ও কর্মের অধিকার প্রদান করবে এবং বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে ও অক্ষমতায় সাহায্য দান করবে।

রাষ্ট্র জনগণের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য সচেষ্ট হবে এবং ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত নয় এমন সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে (৪৭ নং ধারা)। "ultimate object of the Directive Principles is to liberate the Indian masses in a positive sense : to free them from the passivity engendered by centuries of coercion by society and nature and ignorance".

এছাড়া সংবিধানে ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকারসহ বেশ কিছু অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। তফশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে। যেমন, তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন, মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন এবং সাম্প্রতিককালে মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য 'সাচার কমিটি' গঠিত হয়েছে।

মানবাধিকার সুরক্ষা (Protection of Human Rights) ঃ

স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৬৪ বছর পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ঘটনা আকছার ঘটছে। দরিদ্র মানুষের, কৃষকের, শ্রমিকের, নারীর, শিশুর এবং বৃদ্ধের মানবাধিকার বারংবার লঙ্ঘিত হয়েছে। ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণের কতকগুলি পদ্ধতি বিদ্যমান। এগুলি হল—

(১) ভারত বহুতত্ত্ববাদী সমাজব্যবস্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনধারণের মান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাই মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি এখানে বহুমুখী। কারণ একই সঙ্গে সাম্যের অধিকারের রক্ষা এবং বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পদক্ষেপের গুরুত্ব স্বীকার্য। যেমন—রাষ্ট্র ও অনান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ এ বিষয়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, কমিশন ও কমিটি গঠন ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(২) ভারতের নাগরিকদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে। কারণ ভারতীয় কোনো নাগরিকের কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে ওই অধিকারের মাধ্যমে তার প্রতিবিধান ও প্রতিকার পাওয়া যায় ইত্যাদি।

মানবাধিকার সুরক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Impediments Regarding the Protection of Human Rights) ঃ

ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত বলে মনে হয়নি। এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থা মানবাধিকারের বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি বাধার সৃষ্টি করেছে।

জাত ও বর্ণ নির্ভর ভারতীয় সমাজ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের মানুষদের নানাভাবে দমিয়ে রাখে বা বলা ভালো নিম্নবর্ণের মানুষদের অধিকার এই উচ্চবর্ণের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। একবিংশ শতাব্দীর ভারতেও মানুষকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হয়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলিত। জাতিগত, সামাজিক, ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিজেদের অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে না। আবার অনেক সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। ২০০২ সালের গুজরাটের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার জয়গান করতে পারি না।

আইন করে ১৪ বছরের কম বয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের অর্থের বিনিময়ে বা জোর করে ভয় দেখিয়ে শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না বলে বলা হলেও ক্ষুধার জ্বালায় অনেক পিতামাতা তার শিশুকে কলকারখানা বা অন্য কোনো কঠিন কাজে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়। পণপ্রথা ভারতীয় সমাজে এক জ্বলন্ত সমস্যা। পণ দিতে না পারার কারণে আজও অনেক বধূকে হত্যা করা হয় বা তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। ভ্রূণ হত্যার মত ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

দমনপীড়ন রাষ্ট্রীয় মানবাধিকারের পরিপন্থী। আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ অনেক সময় জাতীয় সংহতি বা জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। তারা নারী, শিশু ও পুরুষের উপর শুধু অত্যাচারই করে না অনেক সময় সংবিধানের ২১ নং ধারার অপমৃত্যুও ঘটায়, যা মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনোভাবেই কাম্য নয়।

সরকার প্রণীত বিভিন্ন আইনও মানবাধিকারের বিরোধী। PDA (Prevention of Detention Act, 1950), MISA (Maintenance of Internal Security Act, 1971), ESMA (Essential Services Maintenance Act, 1981), COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1971) এবং সম্প্রতি POTA (Prevention of Terrorism Act, 2002) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি (Nature and Trends of Human Rights Movement in India) ঃ

অধুনা ভারতে যে সকল মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে সেগুলি মূলত শোষিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আমরা ব্রিটিশ শাসন আমলে প্রত্যক্ষ করেছি কীভাবে বঞ্চিত শোষিত মানুষদের অধিকার রক্ষার লড়াই একের পর এক পরিচালিত হয়েছিল ব্রিটিশ-

Scanned with CamScanner

রাজের বিরুদ্ধে। বর্তমানেও ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। দলিত ও অত্যাচারিত জনসম্প্রদায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন লড়াই-এ সামিল হচ্ছে। পরিবেশ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে।

মানবাধিকার আন্দোলনের একটি নবতম সংযোজন পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের তাগিদে যে সকল অধিকার স্বীকার করে নিচ্ছে পরিবেশের অধিকার তার অন্যতম। এই অধিকার মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও আজ আর তা কেবলমাত্র মানবকেন্দ্রিক অধিকার হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। গাছপালা, পশু-পাখি, নদী, পাহাড় ইত্যাদি অধিকারের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে মধ্য হিমালয়ে চিপ্‌কো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। গাড়োয়ালের বনজাত সম্পদের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে পার্বত্য গ্রামবাসীরা এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল অবৈধভাবে বন সম্পদের ধ্বংসসাধন বন্ধ করা। ১৯৭৬ সালে কেরলের পালঘাট জেলার সাইলেন্ট ভ্যালি উপত্যকায় কুন্তী নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হলে স্থানীয় জনগণ পরিবেশ রক্ষার্থে এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনও পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাঁধ নির্মাণের জন্য যে সকল কৃষক বাস্তুচ্যুত ও জীবিকাহারা হবে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরাপত্তারক্ষীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মণিপুরের মহিলারা আন্দোলন করছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও ব্যবস্থাতে সাম্য ও সামাজিক বিচারের লক্ষ্যে নারী আন্দোলন পরিচালিত। প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে বিশেষত বিংশ শতাব্দীর পূর্বে শোষণ কাঠামো ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় আন্দোলনগুলির ঝটিকা কেন্দ্রে মহিলাদের অবস্থান ছিল। বিংশ শতাব্দীতে বাংলায় কিছু মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা উত্তরকালীন সময়ের নারীবাদী আন্দোলনকে নয়া-সামাজিক আন্দোলনের তাত্ত্বিকগণ (যেমন জন কোহেন, ট্যুরেইন) ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আন্দোলনের মধ্যে সংযোগসাধনের চেষ্টা করেছেন। সাধারণত অনুমান করা হয় যে '৭০-এর দশকের পূর্বে মহিলারা একরকম প্রায় নীরব ছিল। কিন্তু বাস্তব বিচারে এই অনুমান সঠিক নয়। কারণ ইতিহাসের সংবেদনশীলতা এটাই প্রমাণ করে যে, মহিলারা লিঙ্গ বৈষম্য ও পিতৃতান্ত্রিক সংস্থার শোষণের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার। তবে '৭০-এর দশক থেকে ভারতে নারী আন্দোলন যে নতুন মাত্রা পেয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এই সময় ভারতীয় রাজনীতিতে বেশ কতগুলি ঘটনা ঘটে যায়। যেমন, ১৯৭১ সালে জরুরি অবস্থায় নারী স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত নেমে আসে, Committee on the Status of Women in India-এর প্রতিবেদনে নারীজাতির চরম অবহেলিত চিত্র প্রকাশিত হয় ইত্যাদি। '৮০ দশকে এবং আরো পরবর্তীতে '৯০-এর দশকে মহিলা সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে এবং এই সংগঠনগুলি মহিলাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া বর্তমান। তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের দাবিতে সোচ্চারিত। ভারতে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সংস্থাগুলো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে রক্ষার জন্য আন্দোলন করছে। এই ধরনের সংস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—People Union for Democratic Rights (দিল্লি), Peoples Union for Civil Liberties, APCLC (হায়দ্রাবাদ), APDR (কলকাতা) CPDR (মুম্বাই), চিপ্‌কো আন্দোলন থেকে শুরু করে মাদকবিরোধী আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার জন্য এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ আন্দোলন চালিয়েছিল। শিশুশ্রম, শিশুনিগ্রহ, নারী নির্যাতন

Scanned with CamScanner

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু হয়েছে। বস্তিবাসী জনগণ ও ফুটপাতবাসীদের মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন জোরালো হচ্ছে।

এছাড়া মানবাধিকার বিপন্নতার আরও কতকগুলো দিক হল—জেলবন্দি আসামিদের প্রতি অত্যাচার করা, শিশু-কিশোরদের জন্য গঠিত হোমগুলোতে কর্তৃপক্ষের অত্যাচার, উদ্বাস্তুদের প্রতি অমানবিক আচরণ, সরকারি মানসিক হাসপাতালের রোগীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার ও তাদেরকে ন্যূনতম পুষ্টিকর খাবার ও পরিসেবা প্রদান না করা, চিকিৎসকদ্বারা রোগীদের প্রতারিত হবার ঘটনা, পণ দিতে না পারার জন্য মৃত্যু, সন্ত্রাসবাদী কিংবা সম্প্রতি মাওবাদীদের হাতে বিপন্ন হওয়া সাধারণ মানুষের জীবনহানি, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের লাঞ্ছিত হওয়া প্রভৃতি। বর্তমানে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা, গণমাধ্যমের প্রচার এবং মহিলা ও শিশুদের জন্য গঠিত সংস্থাগুলোর দ্বারা মানবাধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন চলছে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। ক্রেতা সুরক্ষার জন্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালত ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

মানবাধিকার কী সরকার দ্বারা না বেসরকারি সংগঠন বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর দ্বারা লঙ্ঘিত হচ্ছে? এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা সরকারি সংশোধনাগার ও হোমগুলোতে যেমন অত্যাচারের ফলে বন্দি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, আবার সরকারি মদতে বিরুদ্ধবাদী নাগরিকদের খুন করার ঘটনা ঘটে। ১৯৭০-এ পশ্চিমবঙ্গে নকশালদের বিরুদ্ধে হয়েছিল। অধুনা মাওবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ডে মানুষ খুনের ঘটনা ঘটছে। অসমে আলফা ও বোড়ো জঙ্গিগোষ্ঠী মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে—হিংসার মধ্য দিয়ে। সুতরাং, বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এই যে, মানবাধিকার বিষয়টি যেমন ব্যাপকতর ও জটিল, তেমনি মানবাধিকার আন্দোলনের মাত্রাও বহুমাত্রিক। ভারতের মত নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের দেশে মানবাধিকার আন্দোলন করা সত্যিই চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলেছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। তবে ২০০৪ সালে 'ইউনিয়ন ক্যাবিনেট'-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সকল নাগরিক ও সংগঠনকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে বাধ্য থাকবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সুতরাং, মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলোর পক্ষে তা সুবিধাজনক হয়েছিল—কারণ সরকারি ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে দায়বদ্ধতার সঙ্গে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

মানবাধিকার আন্দোলনের সাফল্য (Success of Human Rights Movements) ঃ

আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন সময় সরকার আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। অনেক নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন পাশ হয়েছে যা এই সকল আন্দোলনেরই ফসল। ১৯৭৪ সালে জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১ সালে বায়ু (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬ সালে পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৯১ সালে লোক দায়িত্ব বীমা আইন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণীত হয়েছে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সরকার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের আন্দোলনের ফলে মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি নতুন নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থার চেষ্টা চলেছে।

নারীরা বিভিন্নক্ষেত্রে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হচ্ছে। ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলিতে মহিলাদের জন্য মোট আসনের $\frac{1}{3}$ অংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে শিশুশ্রম রদ করা হয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে। পণপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে।

Scanned with CamScanner

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission) ঃ

১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ভিত্তিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান অথবা প্রাক্তন কোনো প্রধান বিচারপতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি হবেন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের একজন বর্তমান অথবা প্রাক্তন বিচারপতি, হাইকোর্টের একজন বর্তমান অথবা প্রাক্তন বিচারপতি থাকবেন। মানবাধিকার বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ দুইজন ব্যক্তি এই কমিশনের সদস্য হবেন বলা হয়েছে। এছাড়া সংখ্যালঘু জাতীয় কমিশনের সভাপতি, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি এবং মহিলা জাতীয় কমিশনের সভাপতি এই কমিশনের সদস্যপদ লাভ করেন। সভাপতিসহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হল ৫ বছর। সদস্যদের দ্বিতীয়বার সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। তবে ৭০ বছর অতিক্রান্ত হলে ব্যক্তির সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। কমিশনের সদস্যপদ থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি কেন্দ্র অথবা রাজ্যে সরকারি কোনো পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি তাঁর নির্দেশবলে কমিশনের সকল সদস্যদের নিয়োগ করেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি একটি উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ এই নিয়োগ করে থাকেন। এই উচ্চতর কমিটি গঠিত হয় এইসকল সদস্যদের নিয়ে ঃ (ক) প্রধানমন্ত্রী (সভাপতি), (খ) লোকসভার অধ্যক্ষ, (গ) কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, (ঘ) লোকসভার বিরোধী দলের নেতা, (ঙ) রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা এবং (চ) রাজ্যসভার সহ-সভাপতি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Power and Functions of NHRC) ঃ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান কাজগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

১। নিজস্ব তথ্য, ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তির অভিযোগ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে অনুসন্ধান করা।

২। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত কোনো বিষয় যদি আদালতের বিচারাধীন থাকে তাহলে ওই আদালতের অনুমতি নিয়ে কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৩। সংবিধান অথবা প্রচলিত আইনে মানবাধিকার রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা বর্ণিত রয়েছে কমিশন সেগুলির পর্যালোচনা ও তাদের সুষ্ঠু রূপায়নের ব্যবস্থা করতে পারে।

৪। মানবাধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র ও আইনের রূপায়নের ব্যবস্থা করা।

৫। সন্ত্রাসবাদ সহ মানবাধিকারের প্রতিবন্ধকতাগুলি মূল্যায়ন করে সেগুলির প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করতে পারে।

৬। মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোনো সরকারি কর্মচারীর কর্তব্য পালনের গাফিলতির বিষয়ে কমিশন অনুসন্ধান করতে পারে।

৭। বন্দিদের অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশন রাজ্য সরকারকে জানিয়ে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রিত কোনো কারাগার অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারে।

৮। সেনাবাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশন বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে পারে। এক্ষেত্রে কমিশন প্রথম সরকারের কাছে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পাবার পর কমিশন সে বিষয়ে মতামতসহ সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করতে পারে।

৯। মানবাধিকার সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সচেতন করে তোলার জন্য কমিশন শিক্ষার বিস্তারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা, গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

১০। মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য যে সকল বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে তাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করে থাকে এই কমিশন।

১১। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজকর্ম পরিচালনাকে কমিশন উৎসাহ প্রদান করতে পারে।

১২। মানবাধিকারে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে মানবাধিকার কমিশন।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ঃ

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন ১৯৯৩ অনুসারে প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। আইনের ২১-২৯ নং ধারায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হয়েছে।

গঠন ঃ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হবে।

এঁরা হলেন ঃ—(১) রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চেয়ারপার্সন হিসেবে থাকবেন। (২) একজন সদস্য হবেন হাইকোর্টের বিচারপতি। (৩) রাজ্যের যে-কোনো জেলা জজ যাঁর রাজ্যে জেলা জজরূপে সাত বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। (৪) মানবাধিকার সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অথবা সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী এমন ২ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্য হবেন।

এছাড়া রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে একজন সেক্রেটারি নিযুক্ত হবেন। তিনি চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মানবাধিকার কমিশনের ন্যস্ত সমস্ত কাজকর্ম করবেন।

কমিশনের চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্যদের ওয়ারেন্টের মাধ্যমে রাজ্যপাল নিয়োগ করবেন। রাজ্যপালের স্বাক্ষর ও সিল থাকবে নিয়োগপত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্যরা রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন এ কথা ঠিক কিন্তু তাদের নিয়োগের জন্য একটি কমিটি তৈরি হয়। সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি তৈরি হয় ঃ (১) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কমিটির চেয়ারপার্সন। (২) রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ। (৩) রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও (৪) রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা।

যে সকল রাজ্যে বিধান পরিষদ রয়েছে সেখানে বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিধান পরিষদে বিরোধী দলের নেতা কমিটির সদস্য হবেন।

কার্যকাল ঃ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সনের কার্যকাল পাঁচবছর বা ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত। চেয়ারপার্সন হিসেবে তিনি যেদিন পদে অধিষ্ঠিত হবেন সেইদিন থেকে তার সময়সীমা শুরু। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল পাঁচবছর। তবে প্রয়োজনে পুনর্নিয়োগ করা যেতে পারে আরো পাঁচ বছরের। কিন্তু ৭০ বছর বয়স অতিক্রম করলে কমিশনের কোনও পদে অধিষ্ঠিত থাকা যায় না।

পদচ্যুত করার পদ্ধতি ঃ নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করতে হবে রাজ্যপালের নিকট। এছাড়া নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যদেরকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন। প্রমাণিত অভদ্রজনিত ব্যবহার ও অদক্ষতার কারণ দর্শিয়ে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্টের নিকট রেফারেন্স করাতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট তখন তদন্ত করে যদি এমন সিদ্ধান্তে আসে যে তাদের বরখাস্ত করার কারণ সম্পর্কিত অভিযোগ প্রমাণিত তখন চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যকে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা যেতে পারে। এছাড়া নিম্নোক্ত কারণসমূহে রাষ্ট্রপতি চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যকে বরখাস্ত করার আদেশ জারি করতে পারেন। সেগুলি হল ঃ—(১) দেউলিয়ারূপে ঘোষিত হলে; (২) কমিশনের কার্যে থাকা অবস্থায় যদি অর্থ নিয়ে বাইরের কাজে লিপ্ত হন; (৩) যদি দৈহিক বা

Scanned with CamScanner

মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে কাজ করার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন; (৪) যদি কোনো আদালত কর্তৃক পাগল বলে ঘোষিত হন এবং (৫) যদি কোনো আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে কোন খাটেন এবং নির্দিষ্ট অপরাধটিকে যদি রাষ্ট্রপতি নৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করেন।

কার্য ঃ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন রাজ্য সরকারের নিকট তাদের বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করবেন। যে-কোনো সময় যে-কোনো বিষয়ের উপর বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করা যেতে পারে। রাজ্য সরকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন বিধানসভাতে (যেখানে দুটি কক্ষ রয়েছে সেখানে দুই কক্ষেই) পেশ করবেন। প্রতিবেদনের সঙ্গে একটি মেমোরেন্ডাম থাকবে যাতে উল্লেখ থাকবে কমিশন কোন্ কোন্ বিষয়ে সুপারিশ করেছিল এবং সেই সুপারিশের কতটা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। যে সুপারিশগুলি রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে পারেনি সেইগুলি কোন্ কারণে গ্রহণ করা গেল না তাও জানাতে হবে।

মূল্যায়ন (Evaluation) ঃ

মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন ভারতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ঠিকই তবে তা শহরাঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের মধ্যেই সীমিত হয়ে রয়েছে। মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি তত্ত্বগত ও আইনি পরিকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সামাজিক স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। পাশ্চাত্য মডেলকে অনুসরণ করা ভালো কিন্তু তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সব সময় সাফল্য নাও আসতে পারে। ভারতীয় সমাজের নিজস্ব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই মানবাধিকার রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ যদিও কিছু বিধি-নির্দেশ প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেছে, কিন্তু বিচার বিভাগকে আরও সক্রিয় হয়ে মানবাধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। ভারতের বিচার বিভাগ বিভিন্ন রায়ে মানবাধিকার রক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শাহবানু মামলায়, পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত মামলায় ইতিবাচক রায় দিয়ে মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করেছে। শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার বিস্তার ঘটিয়ে পুরো সমাজকে উন্নত করতে পারলে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি সাফল্য পাবে। এটা ঠিক যে, বিকেন্দ্রীকরণের মৌলিক সত্তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার রক্ষাকবচ।

ঃ তথ্যসূত্র ঃ

1. Chakrabarti, R. : *Studies in the Political Science*, World Press, 1965,
2. Chowdhuri, Chinmoy : *Concept and the Protection of Human Rights*, Deys Publications
3. Raphael, D. D. (ed) : *Political Theory and the Rights of Man*, Macmillan, New Delhi.
4. Mukhapadhya, Shakti, Mukhapadhya, Indrani : *Bharater Sashan Vabasta and Rajniti*, World Press, Kolkata.
5. দাশগুপ্ত, শুভেন্দু : প্রসঙ্গ মানবাধিকার, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা।

Scanned with CamScanner